সাক্ষাৎকার : সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

প্রশ্ন : 'অনুবাদ কবিতা' বলে কোন কিছুর অস্তিত্ব সম্ভব কি? অথবা অনুবাদে কবিতা কতখানি কবিতা থাকে।

সুনীল : অনুবাদে খাঁটি কবিতার স্বাদ পাওয়া অসম্ভব বললেই চলে। কারণ কবিতা মূলত শব্দ নির্ভর। অনুবাদে কবির সেই নিজস্ব শব্দ ব্যবহারের বৈশিষ্ট্য থাকে না। তবু দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাবার মতন অনুবাদ কবিতাও একেবারে উপকারিতা হীন নয়। অনুবাদের পর আর কবিতা বলে কিছু থাকে না, যা থাকে তার নাম 'অনুবাদ কবিতা' এটা একটা আলাদা জিনিস, খুব খারাপও নয়।

প্রশ্ন : কবি যখন অনুবাদক তখন তিনি কতটুকু কবি এবং কতটুকু অনুবাদক।

সুনীল : কবি যখন অনুবাদ করতে যান তখন তিনি খুব কম অংশেই অনুবাদক এবং বেশি অংশে কবি। তিনি যখন বাজার করতে যান, তখনও তাঁর সম্পর্কে এই কথাটি খাটে।

প্রশ্ন : কোনও কবিতায় শব্দ, অলংকার, প্রবচন এবং পরিবেশ থেকে উদ্ভূত এমন একটা স্বকীয়তা থাকে, যা একান্তভাবে দেশীয়। অনুবাদে তার যথার্থ স্বাদ বজায় রাখা কি সম্ভব।

সুনীল : না, বজায় রাখা সম্ভব নয়। টি. এস. এলিয়টের কবিতা ক্রিসমাস ফেয়ারকে বিষ্ণু দে রথের মেলা করেছিলেন। মূলের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষার চেয়েও যে ভাষায় কবিতা রচনা করা হচ্ছে, সেই ভাষায় পাঠযোগ্যতাই বেশি দরকার।

প্রশ্ন : সাম্প্রতিক কালের বিশেষ কোনও কোনও ভাষার কবিতা বাংলায় অনূদিত হওয়া দরকার বলে মনে করেন কি, এবং কেন?

সুনীল : এরকম কিছু আমি মনে করিনা। তবে নানা ভাষা থেকে কিছু কিছু অনুবাদ হলে, সেই ভাষার বা সাহিত্যের কিছুটা খবর অন্তত পাওয়া যায়। ফরাসী বা জার্মান কবিতা বিষয়ে আমরা যতটুকু জানি, তা তো অনুবাদের মাধ্যমেই।

প্রশ্ন : অনুবাদের কাজে বাংলা কবিতার সঙ্গে বিদেশি কোনও কবিতার চারিত্রিক সাযুজ্য খুঁজে পেয়েছেন কি।

সুনীল : আমার মতে, আধুনিক বাংলা কবিতা মেজাজের দিক থেকে আধুনিক ফরাসী বা ইংরেজি কবিতা থেকে খুব দূরে নয়। কিংবা একটু ভুল বললাম, আধুনিক ইংরেজি কবিতা বাংলা কবিতার তুলনায় একটু দরিদ্র। ইটালিয়ান কবিদের সঙ্গেও, আমি যেটুকু পড়েছি, আধুনিক কবিদের অনেকটা মিল আছে বলে মনে হয়।

শিলীন্ধ্র পত্রিকা'র 'অনুবাদ কবিতা' সংখ্যায় ১৯৭৪ সালে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় প্রদত্ত সাক্ষাৎকারটি তাঁর প্রতি শ্রদ্ধায় পুনর্মুদ্রিত হলো।

সাক্ষাৎকার : সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

একজন লেখকের জীবন শুরু হয় তার মৃত্যুর পর থেকে...

বলাকা : সুনীলদা, কবিতাকে নিয়ে দীর্ঘ পরিক্রমা। আজও কবিতা সঙ্গী। এই মধ্যবর্তী সময়ে কবিতার ধারা পাল্টেছে বিভিন্ন সময়ে। বিভিন্ন মতবাদ এসেছে। কবিতায় কোনো মতবাদে আপনি বিশ্বাসী?

সুনীল : না কোনো মতবাদে নয়, তবু কারো কারো বিশ্বাস থাকে। সে বিশ্বাসটা আঁকড়ে ধরে থাকে। কেউ কেউ বিশ্বাস বদলায়। যেমন সুভাষ মুখোপাধ্যায় দীর্ঘকাল মার্কসবাদী দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। আদর্শে বিশ্বাস করতেন। শেষ জীবনে একেবারে পরিত্যাগ করেন। কারোকারো ক্ষেত্রে হয়েছে। আমার সেরকম বিশ্বাস ছিল না। তবে একটা জীবনদর্শন থাকে। সেটা আস্তে আস্তে গড়ে ওঠে। অল্প বয়সে একটা ভাঙচুরের দিকে ঝোঁক থাকে। এটা ভাঙবো সেটা ভাঙবো, আঙ্গিক ভাঙবো, এসব ঝোঁক থাকে। সেগুলিই ভাল অবশ্য। কিন্তু পরবর্তীকালে নিজস্ব জীবনের একটা কথা বলতে ইচ্ছে করে। জীবনদর্শনের কথা বলতে ইচ্ছে করে। কেউ কেউ যেমন ধর্ম বিশ্বাসে চলে যায়। কেউ কেউ প্রচারের দিকে চলে যায়। কিন্তু এ গুলোর দিকে না গেলেও নিজস্ব কিছু বক্তব্য রেখে যায়।

বলাকা : যদি কোনো কবি মতবাদ থেকে মতবাদে স্থানান্তরিত হন তবে তিনি কি মতবাদে বিচ্যুত নাকি বিভিন্ন মতবাদে গিয়ে সমৃদ্ধ হলেন।

সুনীল : এ ঠিক বলা যায় না। যদি এক মতবাদ থেকে অন্য মতবাদে যান প্রথমে লোকে প্রশ্ন করেন। কেন গেলেন, নিজেও তিনি দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েন যে বহুকাল পরে মতবাদ পাল্টালেন কেন? তবে লেখা কী রকম হবে না হবে সেটা এক একটা ক্ষেত্রে একেক রকম। এটা বলা যায় না।

বলাকা : সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তন, কল্লোল যুগ, হাংরি জেনারেশন, পোস্টমডার্নিজম ইত্যাদি চিন্তার প্রতিফলন কতখানি প্রাসঙ্গিক? এটা কি যে কোনো দেশের কবিতার সভ্যতার ক্ষেত্রে সত্যি, যে শুধু ভারতবর্ষ বা বাংলা কবিতা বলে নয়?

সুনীল : হ্যাঁ একটা সময় ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দী বা বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত যে একটা কোনো ইজম তৈরি করে (মার্কসবাদকে বাদ দিচ্ছি) একটা হইচই করা, সেটা হচ্ছে পাঠকদেরও নাড়াচাড়া দেওয়া। আরে, কবিরা চেঁচামেচি করলে

নানা রকম উদ্ভট কাণ্ডকারখানা করলে তারা ভাববে সে সমাজে এখনো কবিতা লেখাটেখা হয়, সচকিত হয়। যারা নেতৃস্থানীয় তারা একসময় হারিয়ে যায়। আলাদা ভাবে, যেমন ধরো স্যুররিয়ালিজম বা ডাডাইজম এগুলো এই সব আন্দোলনের যারা প্রবক্তা তারা হারিয়ে গেছে কিন্তু ওদের অন্যতম কবি অ্যাপোললিয়র মহাকবি হয়ে গেছেন। যেমন ধরো কল্লোল যুগ, এই যুগে বিদ্রোহের সময় ছিল। পাঠকরা অভ্যস্ত ছিল বাংলা কবিতা এরকম হবে, পেলব নরম ছন্দোবদ্ধ, সেখানে ধাক্কা দেয় এরা। কিন্তু যারা নেতা ছিল—প্রেমেন্দ্র মিত্র বা অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত এদের থেকেও কোথা থেকে চলে এলেন জীবনানন্দ দাশ, তিনি কিন্তু এই আন্দোলনে ছিলেন না কিন্তু দলে ছিলেন।

বলাকা : সকলেই কবি নয়। এই প্রবাদপ্রতিম কথাটির সঙ্গে কতখানি সহমত পোষণ করেন?

সুনীল : এটা একটা নির্মম সত্য। অনেকে দেখা যায় পড়াশোনায় খুব ভাল অগাধ জ্ঞান, লিখতে গেলে দেখা যাবে লেখাটা সৃষ্টিশীল হয় না। কবি ও কারও কারও লেখায় প্রথম থেকেই ভাষায় একটা যে মাধুর্য্য আছে সেই সময় বেরিয়ে পড়ে, এটা বলা খুব শক্ত যে কে লিখতে পারবে কে লিখতে পারবে না। সকলের মধ্যেই একটা কবিত্ববোধ আছে কিন্তু ভাষায় প্রকাশ না করতে পারলে তো হবে না। সেই ভাষা জ্ঞানটি সবার তৈরি হয় না। জীবনানন্দ বোধহয় এটাই বলতে চেয়েছেন।

বলাকা : এই প্রসঙ্গে বলি সুনীলদা যে, যখন কবিতা পত্রিকা চলছে তখন কৃত্তিবাস তৈরি হল, মনে হয়েছে নতুন প্রজন্মের, আপনাদের কবিতা লেখার সূত্র ধরে এত কবির সাহস পাওয়া কবিতা লেখার। আপনার কী মনে হয়?

সুনীল : হ্যাঁ কবিতা পত্রিকা ছিল এক সময় প্রধান পত্রিকা। যাতে কোনো কবির লেখা যদি ছাপা হতো তাহলে সে মনে করতো সে একটা স্বীকৃতি পেল। বুদ্ধদেব বসুর মতো প্রধান সাহিত্য ব্যক্তিত্বের কাছ থেকে স্বীকৃতি পাওয়া কম কথা নয়। তাই ওই সময়ে আমরা কৃত্তিবাস বার করি মূলত তরুণ কবিদের জন্যে। কৃত্তিবাসের মলাটের ওপর লেখা থাকতো যে তরুণতম কবিদের মুখপত্র। নামকরা কবিদের কাছে লেখাও চাইতাম না। একটি পত্রিকা বার করতে গেলে অনেকে একটু প্রবীণ কবিদের কাছে গিয়ে লেখা চায়। এমকী দু-একজন প্রবীণ কবি ভুল করে আমাদের কাছে লেখা পাঠিয়ে দিতেন, আমরা সবিনয়ে ফেরৎ দিয়ে দিতাম। কৃত্তিবাস যখন বেরোয়, কয়েক সংখ্যা বেরোবার পর বুদ্ধদেব বসু, উনি বলেন যে উনি এখনকার তরুণদের লেখা আর পড়তে পারছেন না। সুতরাং কবিতা পত্রিকা আর বেরোবার কোনো দরকার নেই। না বোঝার কারণটা বোধহয় আমার মনে হয় আঙ্গিকগত পরিবর্তন খানিকটা হয়েইছিল এবং দৃষ্টিভঙ্গিরও পরিবর্তন হয়েছিল। উনি আমাকে

দু-একটা চিঠিতে বলেছিলেন যে, এখন অনেকের কবিতায় মনে হয় ছন্দ ভুল, আমরা আবার বলতে চাই, না—ওই ছন্দটাই আধুনিক প্রয়োগ। আমরা মুখের ভাষা এনেছিলাম তো, মাত্রার একটু এদিক ওদিক পরিবর্তন করতাম, উনি মনে করতেন সেটা ভুল। সে সব বিষয়ে তর্কবিতর্ক হত। উনি তারপর একসময় কবিতা পত্রিকা বন্ধই করে দিলেন। কবিতা পত্রিকা পরের কয়েকটা সংখ্যা বেরিয়েছে অন্য উদ্যোগে। আমাদের কৃত্তিবাসটা চলতে লাগল। মাঝে মাঝে বেরোয় বন্ধ হয়। একেবারে মরে যায় নি কখনো।

বলাকা : আপনারা কবিতা পত্রিকা বন্ধ হয়ে যাবার সময় লিখলেন যে আমাদের সে রকম আর কাগজ রইল কোথায় যেখানে লিখলে আমরা গর্ব অনুভব করবো। দেখা যায় ১৯৩৩-এ দেশ পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করেছে, তো দেশ পত্রিকা ও কবিতা পত্রিকা, আপনারা কিভাবে দেখতেন। কোথায় কবিতা ছাপা হলে বেশী শ্লাঘা অনুভূত হত?

সুনীল : হ্যাঁ, আমাদের সময়ও ছিল, সেই সময়ে দেশ পত্রিকা অত আকর্ষণীয় ছিল না। দেশ পত্রিকায় যে কবিতার স্ট্যান্ডার্ড তা দেখে মনে হত লঘু-গুরু একসঙ্গে মিশে থাকে। এমন কী তখন সাধু বাংলার কবিতাও ছাপা হত। দেশ পত্রিকায় অনেক অকবির কবিতাও বড় বড় করে ছাপা হত। তখন আবার কতগুলো তফাৎ ছিল। কবিতা ছাপা হত অন্য লেখার তলায়। ধরো, একটা প্রবন্ধের নীচে খানিকটা জায়গা আছে, সেখানে ছাপা হল একটা কবিতা। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ঠাট্টা করে বলেছিলেন যে গদ্যের পদতলে স্থান বলে কবিতার আরেক নাম পদ্য। তা আমরা যখন ঢুকে পড়ি, ঢুকে পড়ে আন্দোলন করি, সম্পাদকের সঙ্গে ব্যক্তিগত সূত্রে যোগাযোগ করে আদায় করি যে কবিতাকে আলাদা সম্মান দিতে হবে। পুরোনো আমলের দেশ-এ দেখবে যে কবিতা তলায় তলায় ছাপা হত। আমাদের লেখাও অনেক সময় ছাপা হয়েছে। পরে, পরবর্তীকালে সব আলাদা পৃষ্ঠায় ছাপা হত। আরেকটা তফাৎ ছিল যে, অনেক কবিতা ছিল যেগুলোকে আমরা কবিতা মনে করতাম না, যেমন বনফুল তিনি কবিতা লিখতেন। অচিন্ত্যকুমার কবিই ছিলেন পরবর্তীকালে গদ্যে চলে যান এবং কবিতাটাও প্রাচীনধর্মী হয়ে যায়। এদের কবিতা আলাদা পৃষ্ঠায় বড় বড় করে ছাপা হত, যেহেতু এরা বিখ্যাত লোক। অন্যদের কবিতা তিন চারটে একসঙ্গে যেমন ছাপা হয়, ছাপা হত। সেটাও আমরা আপত্তি জানিয়েছিলাম যে —কবিতা, কবিতা। আর তরুণদের কবিতায় এরকম একটা ব্যবধান করা ঠিক নয়। এগুলো দেশ পত্রিকার সম্পাদক সাগরময় ঘোষ মেনে নিয়েছিলেন একসময়। এখন দেখো যারই কবিতা হোক একইভাবে ছাপা হয়। এগুলো আমরাই করেছি।

বলাকা : আপনার বুদ্ধদেব বসুর চিঠিপত্রে দেখি আপনারা মনে করেছেন যে বুদ্ধদেব বসু আপনাদের কবিতা জগতের শিক্ষার মধ্যে দিয়ে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। বুদ্ধদেব বসুর একটা চিঠিতে আপনার কবিতা প্রসঙ্গে স্বীকার করেছেন যে তোমার ছন্দও ঠিক আছে, কিন্তু এটা হলেও ভাল হত। কীভাবে বুদ্ধদেব বসুর সান্নিধ্যে থেকে নিজেদের সমৃদ্ধ করলেন?

সুনীল : প্রথম কথা বুদ্ধবেদ বসু তখন বলতে গেলে একমাত্র প্রবীণ কবি যার কাছে যাওয়া সহজ ছিল। তার কাছে যেতে পারতুম, তর্ক বিতর্ক হত, মতবিরোধ হত কিন্তু কাউকে সে জন্যে তাড়িয়ে দিতেন না। বলতেন না চলে যাও। এই ভাবে মত বিনিময় হত। তা অনেক সময় অন্য কবিদের কাছে যাওয়া সহজ ছিল না। সেদিক থেকে বুদ্ধদেব বসুর কাছ থেকে আমরা শিখেছি অনেক কিছু কিন্তু ছন্দ নিয়ে তর্কটা লেগেই থাকতো। এবং ওর মতামতটা আমরা মানিনি কখনো।

বলাকা : ইদানীং শব্দের বৈশিষ্ট্য কাজে লাগিয়ে কবিতা নির্মাণের একটা প্রয়াস চলছে। শব্দ দুটো পাশাপাশি বসিয়ে শুনতে ভাল লাগছে কিন্তু সেরকম কোনো অর্থ তৈরী হচ্ছে না। এই ধরনের কবিতার ক্ষেত্রে কী মত?

সুনীল : এটা তো হতেই পারে। কবিতায় ধ্বনি-মাধুর্য একটা বড় জিনিস। বা কোন শব্দের পাশে কোন শব্দটা বসানো হল এবং পুরো ব্যাপারটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল এটাও তো কবিত্ব, অনেক সময় কবিতার মধ্যে অর্থ খুঁজতে যাওয়া একটা বিড়ম্বনার ব্যাপার। বা কবি বলেছেন যে তোমরা নিজের মতো অর্থ করে নাও। ব্রাউনিং একটা কথা বলেছেন যে, যখন কবিতাটা লেখা হচ্ছিল তখন ওই কবিতার অর্থ জানবেন দু-জন, আমি এবং ভগবান। এখন এর অর্থ শুধু ভগবানই জানেন আমিও জানি না।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলি, আমরাও তখন এমন কিছু কবিতা লেখার চেষ্টা করেছি যে তার ভিতরে কোনো অর্থই নেই । কারণ কবিতাটা হচ্ছে একটা সামগ্রিক নির্মাণ। তার ধ্বনি তার শব্দ ব্যবহার এই সব মিলিয়ে। তাই প্রতিটি শব্দের অর্থ যে হতেই হবে এমন কোনো কথা নেই।

বলাকা : আপনার সমসাময়িক যারা লিখছেন প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র। শঙ্খ ঘোষ, আলোক সরকার, উৎপল কুমার বসু, সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত প্রমুখ একই সময়ের হয়েও স্বতন্ত্রতা সত্ত্বেও একে অপরের দ্বারা প্রভাবিত হবার...

সুনীল : না, আড্ডা মারতাম তো একসময়ে। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের নাম লিখেছ? ভিতরে ভিতরে একটা জিনিস সবসময় কাজ করতো যে কেউ কারো দ্বারা যেন প্রভাবিত না হয়ে যাই। সেই থেকে স্বতন্ত্র হয়ে গেছি। তবে মিল একটা ছিল। সে মিলটা কী, যে কবিতাগুলো হবে অকপট। মানে, বানানো কবিতা নয়। নিজের

জীবনকে প্রকাশ করতে হবে। অনেকটা স্বীকারোক্তিমূলক কবিতা বলা হয়েছে। এই জন্যেই কৃত্তিবাসের কবি বলতো সবাই। কিন্তু ভাষা ব্যবহারের দিক থেকে ছন্দ ব্যবহারের দিক থেকে, আঙ্গিকগত দিক থেকে আলাদা।

বলাকা : নীরাকে নিয়ে প্রথম কবিতা পাই 'আমি কীরকম ভাবে বেঁচে আছি' কাব্যগ্রন্থে। তারপর প্রচুর কবিতা নীরাকে নিয়ে লেখা। প্রথম যখন লিখেছিলেন তখন এরকম ভাবনা ছিল যে ধারাবাহিকভাবে লেখা হবে নীরাকে নিয়ে?

সুনীল : প্রথমে লেখার সময় ভাবিনি ধারাবাহিকভাবে লিখব। আর দ্বিতীয় কথা নীরাকে নিয়ে কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি চাই না কারণ দিলে ব্যাপারটা আর থাকবে না। প'ড়ে প'ড়ে যেরকম মানে বুঝবে। প্রথম কবিতাটাই তো হঠাৎ নীরার জন্য। হঠাৎ করেই মাথায় এসেছিল, তারপরে মাঝে মাঝে ওটা মনে আসত। নীরা কথাটাকে নিয়ে কেমন ভাবে খেলান যায় ভাবতাম। তারমধ্যে একটা সিগনিফিক্যান্ট লেখা আছে অনেক শেষের দিকে, এই নীরা যে কোনো নারী হবে। মাঝে মাঝে মনে এসেছে মাঝে মাঝে লিখেছি! মাঝে মাঝে মনে হয়েছে যে এটা শিল্প হয়ে যাচ্ছে। শিল্প হলে মূর্তি হয়ে যাচ্ছে। আমি তা নিজের রাখতে চাই। মূর্তি হয়ে যাবে তা থেকে আমি ফিরিয়ে এনে রক্ত মাংসের করতে চাই।

বলাকা : রবীন্দ্রনাথ পরবর্তী বুদ্ধদেব বসু, জীবনানন্দ। এই সময়টায় রবীন্দ্র বিরোধিতা, আপনারা যখন কবিতাই লিখতে এলেন তখন কি মনে হয় রবীন্দ্র বিরোধিতা বা বুদ্ধদেব বিরোধিতা করতে হবে? আপনি বলেছেন একটা ভাঙচুরের ইচ্ছে তখন থাকে। এটা কী মন থেকেই আসে নাকি খানিকটা আরোপিত? তিন জোড়া লাথির ঘায়ে রবীন্দ্ররচনাবলী মাটিতে লুটোয়... এই যে প্রসঙ্গটা কিভাবে এল?

সুনীল : না ঠিক যে সচেতনভাবে করেছি তা নয়, এটা আমার পাঠরুচি থেকে হয়েছে। আমরা যখন পড়তে লাগলাম, বিদেশী কবিতাও পড়তে লাগলাম, এই ভাবে যে একটা পাঠরুচি তৈরি হয় তখন মনে হল যে বাংলা কবিতা যেভাবে লেখা হচ্ছে তা ঠিক নয়, আর একটু অন্যভাবে হওয়া উচিৎ। তো অন্য বাঁক নেওয়া উচিৎ। তখন ভাঙচুরের প্রশ্ন আসে। ছন্দ তখন উঠে যাচ্ছে। আমরা দেখলাম যে, ছন্দ বাংলা কবিতার একটা বৈশিষ্ট্য। এটাকে সরানো যাবে না। থাক ছন্দ, কিন্তু এটাকে একটু বদলান যাক। প্রথাসিদ্ধ ছন্দ রাখতে হবে তার কী মানে আছে? আমার একটা কবিতায় আছে 'মাত্রাহীন আঙুল তুলে' মাত্রা ঠিক থাকছে না। আমাকে নরেশ গুহ বলেছিল এটা কী লিখলে তুমি এখানে তো মাত্রা ঠিক থাকছে না। আমি বলেছিলমু মাত্রাহীন তো বলে দিয়েছি। মাত্রা রাখব না।

এটা সচেতনভাবে একেবারে তাও ঠিক নয়। আবার কোমর বেঁধে করবো এমনও নয়।

বলাকা : আপনি যতীন্দ্রমোহন প্রসঙ্গে একজায়গায় লিখেছেন যে রবীন্দ্রনাথের মতো কবি বিরল, শতকে দু-একজন আসে। এই যে রবীন্দ্রশ্রদ্ধা অথচ আবার রবীন্দ্রবিরোধিতা...

সুনীল : আমাদের রবীন্দ্রবিরোধিতা ছিল খেলার মতো। সত্যি সাত্যিই কি রবীন্দ্র বিরোধী হওয়া যায় নাকি? সত্যি তুমি যদি সাহিত্য ভালবাস, কবিতা ভালবাস তবে রবীন্দ্রবিরোধিতা করা যায় নাকি। ওটা একটা সাময়িক ব্যাপার। ওই যে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে গুরু গুরু করে চেঁচাতেন তাদের একটু আঘাত করা। তখন এসব করতাম বটে তবে আবার একসঙ্গে বসে রবীন্দ্রনাথের গানের কমপিটিশন করতাম। কে কটা গান জানে? বারবার করে রবীন্দ্রনাথ মুখস্থ বলতাম। আমি রবীন্দ্রনাথের 'চার অধ্যায়' উপন্যাসটা পর্যন্ত মুখস্থ করেছিলাম। ওটা গদ্য লেখা। কাজেই এই ধরনের পাঠ ছিল আর বাইরে হয়তো একটা খারাপ কথা বলেছি... একটা খেলার মতো।

ওই তিনজোড়া লাথির ঘায়ে.... এটা একেবারে আক্ষরিক অর্থে। তারাপদ রায়ের বাড়িতে আমরা প্রায়ই গিয়ে আড্ডা মারতাম। ওর খাটটায় শক্তি আমি তারাপদ আর কেউ কেউ ঠেলাঠেলি করে শুতাম। ওর বইপত্তর খাটেই ছড়ান থাকতো, ইচ্ছে করে লাথি মেরে বইগুলো ফেলে দিতাম। ওই যে ছোটবেলায় একটা সংস্কার থাকে যে বইতে পা দিলে নমস্কার করতে হয়... সেটা আস্তে আস্তে কেটে যাচ্ছে। সংস্কারটার উপরে একটা লাথি মারবো বলে বই ইচ্ছে করে ফেলে দিচ্ছি। ওটা রবীন্দ্ররচনাবলী না হলে অন্য রচনাবলীও হতে পারতো। তবে ঠিকই এটা কি ছাপবার সময় মনে হয়নি যে এটা লিখছি..

বলাকা : বিদেশে যাওয়ার সুযোগ শুরুর কাছাকাছি সময়ে। তারপর অগুন্তি বার। বিদেশী কবিতা ও বাংলা কবিতা কি তফাৎ এই মুহূর্তে? পাঠরুচির দিক থেকে কি ভাবা যায়?

সুনীল : বিদেশের মূল স্রোত যেটা বেশীরভাগ ইউরোপীয় ভাষা থেকেই অনূদিত হয় তাই স্রোত বোঝা যায়। কিন্তু চিনে ভাষা বা জাপানী ভাষায় কি লেখা হচ্ছে সেটা খুব একটা বোঝা যায় না। আমরা তো ইউরোপের দিকেই তাকিয়ে থাকি। ফলে জার্মান, স্প্যানিস, ফেঞ্চ ইত্যাদি ভাষায় কবিতাগুলোই বেশি পড়ি। পরে দেখেছি যে আধুনিকতার মানসিকতায় খুব একটা অমিল নেই। আঙ্গিকের দিক থেকে তো মিল দেওয়া, ছন্দ দেওয়া অনেকে কৃত্রিম ভাবেন, তা আমি এক সময় ভাবতাম বাংলা কবিতায় এসব একদমই দরকার নেই। পরে আবার ভেবে দেখেছি এক একটা ভাষায় একধরনের প্রবণতা থাকে, বাংলা কবিতায় ছন্দের দিকে একটা প্রবণতা রয়েই গেছে না হলে একেবারে তরুণ কবিরা

ছন্দে এত লেখে কি করে। ভাল ভাল ছন্দে লেখে। দক্ষ ছন্দ ব্যবহার করে! তাই ছন্দ থাকবে।

বলাকা : কবিতার কোনো ভাগ্য আছে মানেন? না হলে জীবনানন্দ জীবিতকালে মূল্য পেলেন না, পরবর্তীকালে মূল্য পেলেন। বা জীবিত কালে মূল্য পেলেন মৃত্যুর পরে হারিয়ে গেলেন এই রকমকিছু...

সুনীল : মৃত্যুর পরে হারিয়ে যাওয়াটা হচ্ছে অনেকেরই নিয়তি। বেশীর ভাগই মৃত্যুর পর হারিয়ে যায়। আর মৃত্যুর পর যারা আবার জেগে ওঠে সেরকম সংখ্যা কম, তারাই শেষ পর্যন্ত ইতিহাসে স্থান পেয়ে যায়। একটা কথা আছে যে একজন লেখকের জীবন শুরু হয় তার মৃত্যুর পর থেকে। তা এরকমও দেখা হয় তার মৃত্যুর পর থেকে কদিন সে বাঁচবে তার পরে সে হিসেব হয়। তা এরকমও দেখা গেছে জীবিত কালে সম্মান পাননি বরং গঞ্জনা, অবহেলা পেয়েছেন তো মৃত্যুর পর তাকে নিয়ে উন্মাদনা শুরু হয়েছে। পৃথিবীতে অনেক উদাহরণ আছে। যেমন ধরো ফরাসী লেখক স্তাদাল, তাঁর লেখা জীবিত কালে কেউ পাত্তাই দেয়নি। মৃত্যুর পর তিনি বড় ঔপন্যাসিক হিসাবে স্থান পান। এরকম আছে।

বলাকা : মৃত্যুর বিষয় অনুভূতি বহু কবিতায়। এই অমোঘ সত্যের প্রতি কি অনুভব?

সুনীল : আমার তো পরকালে বিশ্বাস নেই। দ্বিতীয় জীবনে বিশ্বাস নেই। কোনো দিকেই কোনো বিশ্বাস নেই। তা তবে ডব্লু বি ইয়েটস্-এর একটা কথা আছে যে পঁয়ত্রিশ বছর বয়স হয়ে গেলে যে লোক মাঝে মাঝে মৃত্যুর কথা চিন্তা করে না সে একটা ইডিয়েট।

একটা তো মৃত্যুর ভাবনা আসেই। ভেবে ভেবে এতগুলো বছর কেটে গেল। মনে হয় দাবা খেলায় ঘুটির মতো...ধরো আমার শরীরটা খারাপ, হঠাৎ শুনলাম আমার এক বন্ধু মারা গেছে। এই যে দাবা খেলার ঘুটির মতো। এক অদ্ভুত ব্যাপার এই সময় হয়। আর মাঝে মাঝে ভাবি কোন ভাবে মরবো? জলে ডুবে, নাকি বিছানায় শুয়ে, কি হঠাৎ হার্ট অ্যাটাক হলো, নাকি অনেকদিন ধরে পড়ে থাকতে হবে... এসব গুলো মাঝে মাঝে মনে হয়। মৃত্যুর অতীত কোনোকথা মনে হয় না।

বলাকা পত্রিকার 'কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়' সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল ২০০৭ সালে। কবি সুনীলের ব্যক্তিজীবন ও কাব্যভাবনা নিয়ে প্রকাশিত হয়েছিল একটি দীর্ঘ সাক্ষাৎকার। বলাকা-য় প্রকাশিত সেই সাক্ষাৎকারের নির্বাচিত কিছু অংশ মুদ্রিত হল এখানে।

কৃতজ্ঞতা—সম্পাদক 'বলাকা'